প্রচলিত বিদআত

নাজমুল আহসান রুহান

ক. বিদআতের অর্থ

বিদআত শব্দটি আরবী البدع শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো, "পূর্বের কোনো দৃষ্টান্ত ও নমুনা ছাড়াই কোনো কিছু সৃষ্টি করা বা উদ্ভাবন করা।" অর্থাৎ, বলা যায় বিদআত অর্থ নতুন আবিষ্কৃত বিষয়াদি। বিদআতকে কিছু কিছু হাদিসে 'মুহদাসাত' শব্দেও উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ 'নবউদ্ভাবন'।

আবিধানিক অর্থে, পূর্বে ছিলোনা এবং পরবর্তীতে আবিষ্কৃত হয়েছে, এমন সবকিছুই বিদআত বলে গণ্য হবে। কিন্তু, শরিয়তের পরিভাষায় সকল নতুন আবিষ্কৃত বিষয়াদিকে বিদআত বলা হয় না। শরিয়তের পরিভাষায় বিদআত হলো, "আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে নতুন করে যার প্রচলন করা হয়েছে এবং এর পক্ষে শরিয়তের কোন ব্যাপক ও সাধারণ কিংবা খাত ও সুনির্দিষ্ট দলীল নেই।"
(কাওয়ায়েদে মারিফাতিল বিদআত, পৃঃ ২৪)

অর্থাৎ, ইসলামে বিদআত সেটাকেই বলা হবে যেটা দ্বীনের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে। দুনিয়াবী প্রয়োজনে উদ্ভাবিত কোনো প্রযুক্তি, পদ্ধতি, কর্ম ইত্যাদি বিদআত হিসেবে গণ্য হবে না। যেমনঃ টিভি, ফ্রিজ, ফ্রি ল্যান্সিং, মিছিল-মিটিং, অফিস, বাস, প্লেন ইত্যাদি।
বিদআত সেটাই যা দ্বীন বা শরিয়তের মাঝে নতুন করে প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু তার স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ থেকে কোনো দলীল পাওয়া যায়না।

বিদআত সাধারণত দুই প্রকার।
১. আকিদাগত বিদআত
২. আমলগত বিদআত

এ আলোচনায়, শুধু আমলগত বিদআত নিয়ে থাকবে, ইন শা আল্লাহ।

খ. বিদআতের পরিচয়

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের অধিকাংশ আহলে হক উলামায়ে কেরামের মতে, "বিদআত হলো দ্বীনের মধ্যে নব-উদ্ভাবিত রীতি বা পদ্ধতি, যা শরিয়তের রীতির মত করে পালিত হয় এবং পালন করার মাধ্যমে বেশি মাত্রায় আল্লাহর ইবাদত বা তার সন্তুষ্টি বা তার সওয়াব আশা করা হয়।"
(শাতেবী, আল ইতিসাম, ১/৫০)

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন,

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

❝ আল্লাহকে সেভাবেই স্মরণ করবে, যেভাবে তোমাদেরকে শেখানো হয়েছে, যা তোমরা জানতে না। ❞ (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৯)

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا

❝আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য ইবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দিয়েছে, যা তারা পালন করে। ❞ (সূরা হজ্জ, আয়াত ৬৭)

এ আয়াত দুটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের জন্য ইবাদতসমূহকে আল্লাহ তায়ালা নির্দিষ্ট করেছেন। আল্লাহ ও তার রাসুল ﷺ যেসব ইবাদত আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন তার বাইরে আর কোনো ইবাদত নেই। ফলে, কেউ যদি নতুন কোনো কাজকে ইবাদত মনে করে, যার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে কিছু বর্ণিত হয়নি, তাহলে সেটা বিদআত হিসেবে গণ্য হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যদি কেউ আমাদের এই কাজে (অর্থাৎ দ্বীন বা শরিয়তে) নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখাত।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২৬৯৭)

এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীনের ভিতর নতুন করে প্রবেশ করানো কোনো আমল গ্রহণযোগ্য হবেনা। বরং, তা প্রত্যাখাত হবে। কোনো কাজ ইবাদত হওয়ার জন্য দলীল আবশ্যক। আর যদি কুরআন-সুন্নাহ থেকে কাজটি ইবাদত সাব্যস্ত না হয়, আবার হারাম বা মাকরুহ সাব্যস্তও না হয়; তখন সেটি মুবাহ বা জায়েজ হিসেবে গণ্য হবে।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেন, “একমাত্র আল্লাহ ও তার রাসুলের আদেশ ব্যতীত কোনো কিছু ইবাদত হিসেবে সাব্যস্ত হবেনা। অতএব, কুরআন-হাদিসে সুস্পষ্ট অনুমতি কিংবা আদেশ পাওয়া না গেলে কোনো কাজ ইবাদত বলে গণ্য হবেনা। অপরদিকে, নায্য লেনদেন ও অন্যান্য কাজ-কারবার হচ্ছে অনুমোদনযোগ্য। সরাসরি, নিষেধাজ্ঞা পাওয়া না গেলে সেটা জায়েজ বা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এজন্যই, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মুশরিকদের নিন্দা করেছেন। তারা হালাল বস্তুকে হারাম বানিয়ে নিয়েছিলো এবং আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা বাদ দিয়ে ভিন্নভাবে তার উপাসনা করেছিলো।” (ইলামুল মুওয়াককিয়িন, খন্ড ১, পৃঃ ৩৪৪-৩৪৫)

সারমর্ম এই যে, কোনো কাজ যদি কুরআন-সুন্নাহ থেকে ইবাদত সাব্যস্ত না হয়; তাহলে সেটাকে ইবাদত মনে করাই বিদআত। জাগতিক নব-উদ্ভাবিত বিষয়াদি আবিধানিক অর্থে বিদআত হলেও পারিভাষিক অর্থে বিদআত হবেনা, যতক্ষণ না সেটাকে ইবাদত হিসেবে করা হচ্ছে।

গ. বিদআত শনাক্ত করার পদ্ধতি

এতক্ষণে, আমরা জানলাম যে বিদআত হলো সেইসকল আমল যেগুলোকে ইবাদত মনে করা হয় এবং এর স্বপক্ষে আল্লাহ কোনো দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। এখন বিদআত শনাক্ত করার সঠিক পদ্ধতি না জানার কারণে অনেকেই বিভ্রান্তিতে নিপতিত হন। যেমনঃ উপমহাদেশের আহলে হাদিস ভাইয়েরা; তারা ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজকেও বিদআত বানিয়ে দেন। কাজেই, কোনটা বিদআত আর কোনটা বিদআত নয় সেটা জানতে হবে। নিচের মূলনীতিগুলো লক্ষ্য করি।

১. কুরআনের আয়াত শরিয়তের অকাট্য দলীল। কাজেই, এখান থেকে যদি কোনো ইবাদত প্রমাণিত হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক।

তবে, অবশ্যই কুরআনের অপব্যাখা করে কেউ কোনো কিছু উদ্ভাবন করলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবেনা। কুরআনের ব্যাখা সেভাবেই করতে হবে যেভাবে রাসুল ﷺ করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম করেছেন এবং আহলুস সুন্নাহর পরবর্তী মুফাসসিরগণ করেছেন।

২. সহিহ হাদিস থেকে যদি কোনো আমল পাওয়া যায়, তাহলে সেটা বিদআত হওয়ার প্রশ্নই আসেনা। পাশপাশি, যদি স্বল্প দুর্বল হাদিসেও কোনো মুস্তাহাব আমলের কথা পাওয়া যায়, তাহলে সেটাও আমলযোগ্য হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡهُ وَمَا نَهٰىكُمۡ عَنۡهُ فَانۡتَهُوۡا‌ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ‌ۘ

❝ রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে কঠোর। ❞ (সূরা হাশর, আয়াত ৭)

৩. রাসুল ﷺ এর আদর্শকে সবচেয়ে ভালোভাবে অনুসরণ করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। এজন্য, তাদের আমল বা বুঝ থেকে পাওয়া কোনো দ্বীনী বিষয় বিদআত হবেনা। বরং, তা মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহ বলেন,

وَالسّٰبِقُوۡنَ الۡاَوَّلُوۡنَ مِنَ الۡمُهٰجِرِيۡنَ وَالۡاَنۡصَارِ وَالَّذِيۡنَ اتَّبَعُوۡهُمۡ بِاِحۡسَانٍ‌ ۙ رَّضِىَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُوۡا عَنۡهُ

❝ মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। ❞ (সূরা তওবা, আয়াত নং ১০০)

৪. নিঃসন্দেহে হিদায়তকে সবচেয়ে ভালোভাবে ধারণ করেছেন প্রথম যুগের মুসলিমেরা। এজন্য, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের যুগে অধিকাংশ আহলে হক থেকে যদি দ্বীনের কোনো কিছুর সমর্থন পাওয়া যায়, তাহলে সেটাও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, রাসুল ﷺ ও সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গির সিলসিলা তাদের মাঝে অবিকৃত ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমার উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ (তাবেয়ীগণ) । অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ (তাবে তাবেয়ীগণ) । অতঃপর এমন লোকদের আগমন হবে যাদের কেউ সাক্ষ্য দানের পূর্বে কসম এবং কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দান করবে।” (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩৬৫১)

৫. যদি দ্বীনের কোনো বিষয়ের উপর আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা বিদআত হবেনা। বরং, তা মানা আবশ্যক।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না।” (সুনানু তিরমিজী, হাদিস নং ২১৬৭)

৬. ঠিক একইভাবে, ফিকহশাস্ত্রে যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো মুজতাহিদ যদি শর্ত সাপেক্ষে কুরআন-সুন্নাহর সারনির্যাস থেকে কিয়াস (অনুমান) বা ইজতিহাদ (গবেষণা) করে কোনো ফতওয়া বা মাসআলা দেন, তাহলে সেটাও বিদআত হবেনা। আল্লাহ বলেন,

فَسْـَٔلُوْٓا اَہۡلَ الذِّکۡرِ اِنۡ کُنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ

❝তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর।❞ (সূরা আন নাহল, আয়াত ৪৩)

৭. কিছু কিছু ইবাদত আছে যেগুলোর হুকুম এবং পদ্ধতি নির্দিষ্ট না। সেগুলোর ক্ষেত্রে, জাগতিক সুবিধার জন্য নিত্য-নতুন বৈধ উপকরণ উদ্ভাবন করা বিদআত নয়, যদি মূল ইবাদতকে ঠিক রাখা হয়। যেমনঃ দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া ব্যাপক হুকুমের অন্তর্ভূক্ত। এখন কেউ যদি তাবলীগের মাধ্যমে বা প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দেয়, সেটা বিদআত হবেনা। কারণ, ইবাদতের উদ্ভাবন বিদআত হলেও এর উপকরণের উদ্ভাবন বিদআত নয়, যদি সেটা শরিয়তসমর্থিত হয়। ঠিক, একইভাবে, মাইক দিয়ে আযান দেওয়া, প্লেনে করে হজ্জে যাওয়াও বিদআত নয়; বরং জায়েজ বা মুবাহ। কিন্তু, এই উপকরণগুলোকে যদি ফজিলতপূর্ণ বা ইবাদতের জন্য আবশ্যক মনে করা হয়, তাহলে তা বিদআত হবে।

এতক্ষণ, বিদআত না হওয়ার কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করলাম। বিদআত তখন হবে যখন উপরে বর্ণিত সকল উসূলের বাইরে গিয়ে মনগড়াভাবে কোনো ইবাদত উদ্ভাবিত হবে।

ঘ. সকল বিদআতই গোমরাহি

কোনটা বিদআত আর কোনটা বিদআত নয়; তা আমরা জানলাম। এখন, এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে, সকল বিদআতই মন্দ। কোনো বিদআত ভালো নয়। পূর্বেই, আমরা দেখেছি রাসুল ﷺ সকল বিদআতকে প্রত্যাখাত বলেছেন।

এছাড়াও, অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (দ্বীনের মধ্যে) নব-উদ্ভাবিত বিষয়। আর নব-উদ্ভাবিত প্রত্যেক বিষয় বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টার পরিণাম জাহান্নাম।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৫৩৫)

আরেক হাদিসে তিনি বলেন, "আমার পরে অচিরেই তোমরা মারাত্মক মতভেদ লক্ষ্য করবে। তখন আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অবশ্যই অবলম্বন করবে, তা দাঁত দিয়ে শক্ত করে কামড়ে ধরবে। আর অবশ্যই তোমরা নব-উদ্ভাবিত (ইবাদতমূলক) কর্মসমূহকে পরিহার করবে। কারণ প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" (সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪২)

এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায় প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহি। বিদআত ভালো হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বর্তমানে, সুন্নী নামধারী কিছু ভাইয়েরা বলেন, 'বিদআত দুই প্রকার। ১. বিদআতে হাসানাহ বা ভালো বিদআত ও ২. বিদআতে সাইয়্যেয়া বা মন্দ বিদআত।' — এটা একটি ভিত্তিহীন কথা। হাদিস থেকে আমরা দেখতে পাই যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক বিদআতকেই গুমরাহি বলে অব্যাহত করেছেন। যারা বিদআতকে হাসানা মনে করেন, তারা হযরত উমর রাদিআল্লাহু আনহুর

একটি বক্তব্য দিয়ে দলীল দেন। উমর রাদিআল্লাহু আনহু ২০ রাকআত তারাবিকে প্রবর্তন করার পর বলেছিলেন, "এটি একটি ভালো বিদআত।" (মুয়াত্তা মালেক, কিতাবুন নিদা, হাদিস নং ২৩১)

এখন, এই বক্তব্য নিয়ে অনেকে বিভ্রান্তিতে পড়েন। মূলত, উমর রাদিআল্লাহু আনহু এখানে কোনো বিদআতের প্রচলন করেননি। বরং, রাসুল ﷺ এর সুন্নতেরই প্রচলন করেছেন। কেননা, ২০ রাকআত তারাবি নবিজী ﷺ এর আমলযোগ্য হাদিস থেকে প্রমাণিত। মূলত, উমর রাদিআল্লাহু আনহু যে 'ভালো বিদআত' বলেছেন, সেটা আবিধানিক অর্থে। আবিধানিক অর্থে সুন্নতের প্রচলনকে বিদআত বলা যায়। কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় সেটাকে বিদআত বলা যায়না।

ঠিক যেভাবে, সালাত শব্দের আবিধানিক অর্থ হলো দোয়া করা। কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায়, যেকোনো দোয়াকে সালাত বা নামাজ বলা হয়না। ঠিক সেভাবেই, উমর রাদিআল্লাহু আনহু এখানে বিদআত শব্দটি আবিধানিক অর্থে নিয়েছেন। পারিভাষিক অর্থে সকল বিদাতই ভ্রষ্টতা, যেটা আমরা হাদিস থেকে দেখতে পাই।

তবে, হ্যা। ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ২০৪ হি.) বিদআতকে ভালো ও মন্দ এই দুইভাগে ভাগ করেছিলেন। কিন্তু, ভালো বিদআত দ্বারা তিনি কোনো নব-উদ্ভাবিত ইবাদতকে বুঝাননি। বরং, জাগতিক উদ্ভাবন ও ইবাদতের উপকরণকে ভালো বিদআত বুঝিয়েছেন এবং যেসকল নব-উদ্ভাবনকে ইবাদত হিসেবে নেওয়া হয় সেগুলোকে মন্দ বিদআত বুঝিয়েছেন। যদিও, জমহুর উলামায়ে কেরাম বিদআতের ব্যাখা এভাবে করেননি। তবে, এব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা মতভেদ নেই যে, যেসকল বিদআতকে ইবাদত বা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য করা হয়, সেগুলো সর্বদাই সাইয়্যেয়া।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৭৯ হি.) বলেন, "যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোনো বিদআত উদ্ভাবন করে এবং মনে করে যে, এ বিদআতটি হাসানা (বা ভালো); তাহলে বুঝতে হবে যে, সে মনে করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ খিয়ানত করেছেন, তার রিসালতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেননি। কারণ, আল্লাহ বলেছেন,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

❝ আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। ❞ (সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত নং ৩)

সুতরাং সে দিন যে বিষয় দ্বীনের অংশ ছিলোনা পরে আর তা কখনো দ্বীনের অংশ হবেনা।" (শাতেবী, আল-ইতিসাম ১/৬৪-৬৫)

এছাড়াও, একটি সহিহ হাদিসে রাসুল ﷺ বলেছেন, "আমার পূর্বের প্রত্যেক নবীরই দায়িত্ব ছিল যে, তিনি তার উম্মতের জন্য যত ভালো বিষয় জানেন সে বিষয়ে তাদেরকে নির্দেশনা দান করবেন এবং তিনি যত খারাপ বিষয়ের কথা জানেন সেগুলো থেকে তাদেরকে সাবধান করবেন।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮৪৪)

কাজেই, ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো বিদআতকে হাসানা বা ভালো মনে করা নবীপ্রেম নয়। বরং, তা নবীর প্রতি অপবাদ দেওয়া। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন এবং

দ্বীনের সকল ভালো বিষয় জানিয়ে দেওয়া নবীগণের দায়িত্ব। কাজেই, কেউ যদি কোনো বিদআতী ইবাদতকে বিদআত জেনেও ভালো মনে করে তাহলে সে বোঝাতে চাইছে যে নবিজী ﷺ তার রিসালতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেননি। (নাউযুবিল্লাহ)

নবিজী ﷺ নিজেই তাদের এই দাবী খন্ডন করেছেন। তিনি বলেন, "এমন কোনো বিষয় বাকি নেই, যা তোমাদের জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে নিয়ে যাবে; সেগুলো তোমাদের নিকট বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।" (আল মুযামুল কাবীর, হাদিস নং ১৬৪৭)

কাজেই, কোনো বিদআত গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। আবিধানিক অর্থে কোনো বিদআত ভালো হতে পারলেও পারিভাষিক অর্থে বা ইবাদতের ক্ষেত্রে সকল বিদআতই গোমরাহি।

৬. বিদআতের পরিণাম

বিদআতের মাধ্যমে আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীনকে বিকৃত করা হয়। যেটাকে, আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি সেটাকে দ্বীনের অংশ বলে দাবি করা হয়। এটা চরম অন্যায় ও সীমালঙ্ঘন। সেজন্য, বিদআতের শাস্তিও অনেক কঠিন। নিচে, হাদিসে বর্ণিত বিদআতী আমল ও আকিদার কয়েকটি শাস্তি লিখে দেওয়া হলো।

১. তওবার মাঝে প্রতিবন্ধকতা

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আল্লাহ প্রত্যেক বিদআতীর তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত স্থগিত রাখেন (গ্রহণ করেননা), যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিদআত বর্জন না করছে।" (ত্ববারানীর আওসত্ব, হাদিস নং ৪২০৩; বাইহাক্বীর শুআবুল ইমান, হাদিস নং ৯৪৫৭)

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৬১ হি.) বলেন, "শয়তানের নিকিট অবাধ্যতা বা পাপাচার থেকে বিদআত বেশি প্রিয়। কেননা, পাপকাজ থেকে তওবা করা হয়ে থাকে। কিন্তু, বিদআত থেকে তওবা করা হয়না।" (মুসনাদে ইবন আল-জা'দ ১৮৮৫; মাজমু' ফাতাওয়া ১১/৪৭২)

২. আল্লাহ ও তার ফেরেশতাদের অভিশাপ এবং ইবাদত কবুল না হওয়া

রাসুল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এর (মদিনার) মধ্যে বিদআত উদ্ভাবন করে কিংবা কোন বিদআতীকে (বিদআতের জন্য) আশ্রয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। আল্লাহ তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদত কবুল করেননা।" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৩১৭২)

৩. হাউজে কাউসার থেকে বিতাড়িত হওয়া

নবী ﷺ বলেছেন, "আমি হাউজে কাউসারের নিকট তোমাদের আগেই হাজির থাকব। তোমাদের থেকে কিছু লোককে আমার নিকট পেশ করা হবে। কিন্তু আমি যখন তাদের পান করাতে উদ্যত হব, তখন তাদেরকে আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়া হবে। আমি বলব, "হে রব! এরা তো আমারই সাথী।"

তখন তিনি বলবেন, ❝তোমার পর তারা নতুন কী (বিদআত) তৈরি করেছে তা তুমি জানো না। ❞" (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭০৪৯)

বিদআতে লিপ্ত হওয়ার শাস্তি খুবই ভয়াবহ। এ থেকে আমাদের সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে। এখন, আসুন প্রচলিত কয়েকটি বিদআত সম্পর্কে আমরা জেনে নিই।

চ. মিলাদ-কিয়াম

প্রথমত, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবিজী ﷺ এর উপর দরুদ পাঠ করা অনেক সওয়াবের কাজ। পাশাপাশি, তার জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করাও কল্যাণমূলক কাজ। কিন্তু, প্রচলিত মিলাদে এসবের সাথে অনেক কিছু জুড়ে দেওয়া দেওয়া হয় এবং সেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বা ইবাদতের অংশ মনে করা হয়। যেমনঃ সম্বসরে সুর দিয়ে মানবসৃষ্ট দরুদ পড়া, হটাৎ করে দাঁড়িয়ে যাওয়া, শেষে জিলাপি বিতরণ করা এবং এর মাঝে বরকত আছে বলে মনে করা। মূলত, এইসমস্ত রীতিনীতির সমষ্টিকে মিলাদ বলা হয়, যেগুলো কুরআন-সুন্নাহ এবং সালাফদের আমল থেকে প্রমাণিত নয়।

প্রচলিত মিলাদের উদ্ভব ঘটে হিজরি ৬০৪ সালে, রাসুল ﷺ এর যুগ থেকে ছয়শত বছর পরে। ইরাকের মাসোল শহরের বাদশাহ আবু সাইদ মুজাফফার উদ্দীন কাওকারী (মৃত্যু ৬৩০ হিঃ) এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম প্রচলিত মিলাদের সূচনা হয়। একাজে বাদশাহকে সমর্থন করে এক দরবারী আলেম যার নাম আবু খাত্তাব বিন ওমর বিন দিহইয়া (মৃত্যু ৬৩৩ হিঃ)। প্রথমে এটি শুধু ১২ই রবিউল আওয়াল পালিত হত। কিন্তু, পরবর্তীতে এটা আরো বিস্তার লাভ করে।
(সূত্রঃ আল বিদায়া ওয়াল নিহায়া ১৩/১৫৯; মিযানুল ইতিদাল ১/১৮৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৫/২৭৪)

উক্ত বাদশাহ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মিসরী মালেকী লেখেন, "সে একজন অপব্যয়ী বাদশাহ ছিলো। সে তার সময়কালের আলেমদের হুকুম দিতো, তারা যেন তাদের ইজতিহাদ ও গবেষণা অনুযায়ী আমল করে এবং অন্য কারো মাযহাবের অনুসরণ না করে। ফলে দুনিয়া পূজারী একদল আলেম তার ভক্ত এবং দলভূক্ত হয়ে পড়ে।" (আল কাওলুল মু'তামাদ ফী আমলিল মাওলিদ, রাহে সুন্নাত সূত্রে,পৃষ্ঠা: ১৬২)

উক্ত আলেম সম্পর্কে ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে হাজার আসকালনি (মৃ. ৮৫২ হি.) রাহিমাহুল্লাহ লেখেন, "সে পূর্ববর্তী ইমাম ও আলেম উলামাদের সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণ করতো। সে ছিল অশ্লীলভাষী, প্রচন্ড নির্বোধ, অহংকারী দ্বীন সম্পর্কে সংকীর্ণমনা ও অলস।" (লিসানুল মিযান-১/৩৩৮)

সুতরাং বুঝা গেল এ প্রচলিত মিলাদ আল্লাহর রাসূল ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেয়ীগণ কিংবা কোনো বুজুর্গ বা অলি-আওলিয়া কর্তৃক প্রচলিত বিষয় নয়। এটি একটি অযোগ্য বাদশাহ ও আলেমের সেচ্ছাচারিতার ফসল। তাই এটি পরিত্যাজ্য এবং বিদআত।

মিলাদের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আমল হচ্ছে দরুদ পড়তে পড়তে হটাৎ করে দাঁড়িয়ে যাওয়া। এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়, রাসুল ﷺ কে সম্মান জানানো। অথচ, রাসুল ﷺ তার জীবদ্দশায় এভাবে সম্মান জানানোর প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি এতে আনন্দবোধ করে যে, লোকজন তার সামনে মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকুক, সে যেন জাহান্নামকে নিজের বাসস্থান হিসেবে নির্ধারিত করে নেয়।” (সুনানু তিরমিজি, হাদিস নং ২৭৫৫)

আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, “সাহাবীদের কাছে রাসুল ﷺ এর চেয়ে প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। অথচ, তারা তাকে দেখে দাঁড়াতেন না। কেননা, তারা এটা জানতেন যে তিনি এটা পছন্দ করেন না।” (সুনানু তিরমিজি, হাদিস নং ২৭৫৪)

কাজেই, নবীজি ﷺ নিজেই যখন তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যাওয়াকে এত অপছন্দ করতেন, তখন তাকে সম্মান দেখাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া এটি তার শানে বেয়াদবি নয়ত কী? আল্লাহ আমাদেরকে এমন জঘন্য বিদআত থেকে হেফাজত করুক।

মিলাদ-কিয়াম যারা করেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা রাসুল ﷺ কে মিলাদের স্থানে হাযির-নাযির মনে করেন। তারা মনে করেন, কোনো স্থানে দরুদ পড়া হলে রাসুল ﷺ নিজেই সেখানে উপস্থিত হন। এটা অত্যন্ত ভয়াবহ একটি আকিদা।

মুফতী আহমেদ রশীদ লুধিয়ানভী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৪২২ হি.) বলেন, “নবী করিম ﷺ সম্পর্কে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, তিনি মিলাদ উদযাপনে আসেন এবং এটি সুস্পষ্ট কুফরী, যার পবিত্রতা কুরআন ও ফিকহশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।” (আহসানুল ফতওয়া ১/৩৪৮)

কেননা, রাসুল ﷺ বলেন, “আল্লাহ তায়ালার কতক ফেরেশতা এমনো রয়েছেন, যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে বেড়ায়। তারা উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌছিয়ে থাকেন।” (সুনানু আন-নাসাঈ, হাদিস নং ১২৮২)

নবী করিম ﷺ আরো বলেন, “যে আমার কবরের নিকট এসে দরুদ পাঠ করবে, আমি তা সরাসরি শুনব। আর যে দূরে থেকে আমার উপর দরুদ পাঠ করবে, তা আমার নিকট পৌছানো হবে।” (শুয়াবুল ইমান, বাইহাকি, হাদিস নং ১৫৮৩)

এ থেকে বোঝা যায়, ফেরেশতারা রাসুল ﷺ এর নিকট দরুদ পৌছে দেন। রাসুল ﷺ নিজে দরুদ শুনতে আসেন না।

এত কিছু জানার পর সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম বিদআত। এটি বিদআত হওয়ার ব্যাপারের উম্মতের শীর্ষস্থানীয় হকপন্থী উলামায়ে কেরাম ফতওয়াও জারি করেছেন এবং এব্যাপারে চার মাযহাব ঐক্যমত পোষণ করেছে।

ইমাম সুয়ুতি রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৯১১ হি.) বলেন, “প্রচলিত মিলাদ না কুরআন-সুন্নাহর কোথাও আছে, না পূর্ববর্তী উম্মতের কোন ব্যক্তি থেকে প্রমাণিত। বরং তা সুস্পষ্ট বিদআত, যার আবিষ্কারক হলো একদল পেটপূজারী।” (আল-হাবী লিল ফাতাওয়া, ১/২২২-২২৩)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭২৮ হি.) লিখেছেন, "প্রচলিত এই মীলাদ অনুষ্ঠান যা সালফে সালিহীনের যুগে ছিল না। যদি এ কাজে কোন ফযিলত ও বরকত থাকত, তবে পূর্বসূরীরা আমাদের চাইতে বেশী হকদার ছিলেন, কারণ তারা নবী প্রেমের ক্ষেত্রে আমাদের চাইতে অনেক অগ্রগামী এবং ভাল কাজে অধিক আগ্রহী ছিলেন।" (ইকতিজা উসসিরাতিল মুস্তাকিম, পৃষ্ঠা ২৬৫)

ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ মিসরি মালেকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "চার মাযহাবের উলামায়ে কেরাম এজাতীয় প্রচলিত মিলাদ নিন্দনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।" (আল ক্বওলুল মুতামাদ, পৃঃ ১৬২)

হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ১৩৬২ হি.) বলেন, "রাসূল ﷺ এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা যদি বিদআত এবং নিয়মনীতি মুক্ত হয় তাহলে অন্যান্য যিকর এর মত সওয়াব এবং উত্তম হবে। তবে বর্তমান সময়ে মিলাদ যে নির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও ভ্রষ্টতার সাথে প্রচলিত আছে তা নিঃসন্দেহে বিদআত। (ইমদাদুল ফতোয়া : ৫/২৪৯, যাকারিয়া বুক ডিপো।)

দারুদ উলুম দেওবন্দের ফতওয়া, "প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম যা নিষিদ্ধ ও নতুন বিষয় দিয়ে ভরপুর। তা নাজায়েজ এবং বিদআত।" (ফতোয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ : ১/১২২)

মিলাদ কিয়াম বিদআত হওয়ার ব্যাপারে হানাফী ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য কয়েকটি ফতওয়ার কিতাবের রেফারেন্স:

[ফাতাওয়া শামী ১/৫২৪,এমদাদুল ফাতাওয়া ৬/৩২৭ আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৪৭,আল জুন্নাহ লিআহলিস সুন্নাহ,১৭৮, দপ্তরে আউয়াল, মাকতুবাত-২৭৩, ফাতাওয়ায়ে আযীযী১৯৯, আশ শারআতুল ইলাহিয়্যা, ১৭৭; মাদখাল ২/১০, আল ফাতাওয়া আল হাদিছিয়্যাহ লি ইবনি হাজার আর হাইতামী ১/৫৮]

এতকিছু জানার পর, হানাফী মাযহাবের কোনো প্রকৃত অনুসারী এটা অস্বীকার করতে পারবে না যে, প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম বিদআত ও নাজায়েজ। তবে, এর বিদআতী নিয়মনীতিগুলো বাদ দিয়ে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিলে একে সহীহ ও বৈধ মিলাদে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

মীলাদের অর্থ হল জন্ম। মীলাদ মাহফিলের উদ্দেশ্য হলো নবীজী ﷺ এর জন্ম যেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে হয়েছে এবং তিনি নবুয়তের ২৩ বছরে উম্মতের জন্য কি কি সুন্নাত বা তরিকা রেখে গেছেন, তার কোনো কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। আলোচনা শেষে শ্রোতাগণ নিজস্ব ভাবে হাদীসে বর্ণিত সহীহ দরূদ ৩ বার বা ১১ বার পড়ে নিতে পারে এবং তারপর সকলে মিলে দু'আ মুনাজাত করতে পারে। এ হলো সহীহ মীলাদের রূপরেখা। এর মধ্যে কোন গুনাহ নেই, বরং এটা বরকতময় মাহফিল।

ছ. ঈদে মিলাদুন্নবী

প্রতি বছর ১২ই রবিউল আওয়াল আসলে, এটিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্মদিন মনে করে একদল বেরলভীপন্থী মুসলিমরা বাইরে মিছিল বের করেন। এই মিছিলে অনেক আমদফূর্তি করা হয়।

কোথাও কোথাও নারী-পুরুষের সম্মিলিত সমাবেশ, নাচানাচি, ঢলাঢলি, গান-বাজনা, ঢোল-তবলা ইত্যাদি হারাম বিষয়াদি থাকে। সবশেষে এই কাজকে অনেক উত্তম ও ধর্মীয় কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এই দিনটাকে সব ঈদের বড় ঈদ বলে দাবী করা হয়।

আল্লাহর রাসুল ﷺ এর সাহাবিরা তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। অথচ তারা কখনো ১২ই রবিউল আওয়াল আসলে ধুমধাম করে মিছিল করতেননা। এমনিকি তাবেয়ী ও তাবেতাবেয়ীরাও কষ্কোণো এমনটি করেননি। ঈদে মিলাদুন্নবী পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত একটি নিকৃষ্ট বিদআত। কারণগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো।

প্রথমত, ইসলামে জন্মদিন পালন করাই জায়েজ নেই। কেননা, জন্মদিনের এই কন্সেপ্টটা খ্রিস্টানদের তৈরি। ব্যক্তিবিশেষে, জন্মদিনকে পবিত্র ও পালনীয় দিন মনে করা পথভ্রষ্ট খ্রিস্টানদের আকিদা। মুসলমানদের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। জন্মদিন যদি আসলেই ভালো কোনো দিন হত তাহলে সালাফে স্বলেহীন থেকে অবশ্যই এর ব্যাপারে কোনো বর্ণনা থাকত। কিন্তু, তা নেই। এজন্য, জন্মদিন খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি, যা পালন করা হারাম।

তার পাশাপাশি, জন্মদিন শয়তানের ধর্মের সবচেয়ে বড় উৎসব। শয়তানপূজারী তথা স্যাটানিস্টদের ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে, "শয়তানের ধর্মে সবচেয়ে বড় উৎসব হলো নিজের জন্মদিন।" (The Satanic Bible, Antor Szander lavely, Chapter XI, Religious Holidays, page no 96)

কাজেই, যেখানে কোনো সাধারণ মানুষের জন্মদিন পালন করা হারাম। সেখানে, নবীজি ﷺ এর মত এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জন্মদিন পালন করা জায়েজ হওয়া অযৌক্তিক।

তাছাড়া, ঈদে মিলাদুন্নবীর সাথে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় সংস্কৃতি ক্রিসমাসের অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। ঈদে মিলাদুন্নবী ও ক্রিসমাসের মধ্যকার কিছু চমৎকার মিল নিম্নরূপঃ

১) 'ক্রিসমাস' অর্থ 'খ্রিষ্টের জন্ম' আর মিলাদুন্নবী' অর্থ 'নবির জন্ম'। অর্থাৎ, উভয়ের নামের অর্থ প্রায় একই।

২) উভয়েই প্রতিবছর নবিদের জন্মদিন ভেবে বিদআতি ভক্তদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয়।

৩) ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ ﷺ কেউই এই কাজ করতে বলেন নাই এবং তাদের সাহাবীরাও এই কাজ করেন নাই।

৪) তাদের মৃত্যুর কয়েকশ' বছর পর আনন্দ-উৎসব করার জন্য এগুলোর জন্ম হয়।

৫) ক্রিসমাস পালনের জন্য খ্রিস্টান ধর্মের বহির্ভূত সংস্কৃতিকে টেনে আনা হয়েছে, একইভাবে ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের জন্য ইসলামের নির্দেশ বহির্ভূত কার্যকলাপকে (তথা জশনে জুলুসকে) টেনে আনা হয়েছে।

৬) ২৫শে ডিসেম্বর যেভাবে ঈসা আলাইহিস সালামের সঠিক জন্মতারিখ না, ঠিক সেভাবেই ১২ই রবিউল আওয়ালও মুহাম্মাদ ﷺ এর সঠিক জন্মতারিখ না। (১২ই রবিউল আওয়ালকে কেউ কেউ রাসুল ﷺ এর জন্মদিন বললেও, এটা খুবই দুর্বল মত। কেননা, হাদিস অনুযায়ী রাসুল ﷺ সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর গবেষণা করে দেখা গিয়েছে, ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার হওয়া অসম্ভব। নবিজী ﷺ এর জন্ম তারিখের ব্যাপারে ৮ ও ৯ রবিউল আওয়ালের মত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য।)

৭) ক্রিসমাসকে খ্রিস্টানরা 'বড়দিন' বলে আর ঈদে মিলাদুন্নবীকে বেরলভীরা 'সব ঈদের বড় ঈদ' বলে।

অনেক ঐতিহাসিকদের মতে, ক্রিসমাসকে কপি করতে গিয়েই মূলত ঈদে মিলাদুন্নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। অর্থাৎ, বলা যায়, এটি সম্পূর্ণ বিদআতপন্থী খ্রিস্টানদের থেকে এসেছে। আর বিধর্মীদের সংস্কৃতির অনুকরণ করা ইসলামে হারাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি যে জাতির আনুরূপ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।" (সহীহুল জামে, হাদিস নং ৬০২৫)

অতএব, যারা মিলাদুন্নবী পালন করছেন তারা মূলত খ্রিস্টানদেরই কাতারে অংশ নিচ্ছেন। বিধর্মীদের অনুকরণের পাশাপাশি, ঈদে মিলাদুন্নবী পালনের মাধ্যমে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ এর অবাধ্যতাও করা হয়। কেননা, রাসুল ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাকে আমাদের জন্য ঈদ হিসেবে নির্দিষ্ট করে দিয়ে গিয়েছেন। এছাড়া, কোনো কোনো হাদিসে ফজিলতের জন্য আরাফার দিন ও জুমার দিনকেও ঈদ বলা হয়েছে। আর এর বাইরে অন্য কোনো দিনকে ঈদ বানিয়ে নিতে নিষেধ করা হয়েছে।

রাসূলে পাক ﷺ বলেন, ‘‘তোমরা (নিজেদের পক্ষ হতে) কোনো মাসকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করো না এবং কোনো দিনকেও ঈদ হিসেবে গ্রহণ করো না।” (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ৭৮৫৩; সনদ হাসান)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৯৫ হি.) বলেন, ‘‘এর মূল কথা হলো, শরিয়ত (মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ) যা ঈদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা হলো ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং আইয়্যামে তাশরিক, তা বছরের ঈদ এবং জুমাবার হলো সপ্তাহের ঈদ। তা ছাড়া মুসলমানরা অন্য কোনো দিন ঈদ এবং উৎসবকাল হিসেবে গ্রহণ করা বিদ'আত। শরিয়তে তার কোনো ভিত্তি নেই।” (লাতায়িফুল মা'আরিফ, ওয়াযীফাতু শাহরি রজব, পৃষ্ঠা ১৮১)

সবশেষে এতে আর সন্দেহ থাকে না যে, ঈদে মিলাদুন্নবী একটি বিদআত। এটি বিদআত হওয়ার স্বপক্ষে ইতিহাসের কিছু গণ্যমান্য আলেমদের বক্তব্য নিচে দেওয়া হলো।

হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানবী রাহিমাহুল্লাহ প্রচলিত ঈদে মীলদুন্নবীর যৌক্তিকতা খন্ডনের পর লিখেন, “মোট কথা, যুক্তি ও শরী'আত উভয় দিক দিয়ে প্রমাণিত হল যে, এই নবোদ্ভাবিত ঈদে মীলাদুন্নবী নাজায়িয, বিদ'আত এবং পরিত্যাজ্য"। (আশরাফুল জওয়াব, পৃষ্ঠা ১৩৮)

সৌদি আরবের প্রধান মুফতী আল্লামা শায়েখ আব্দুল আযীয বিন বায (মৃ. ১৪২০ হি.) রাহিমাহুল্লাহ এর ফাতওয়ায় তিনি এক প্রশ্নের জবাবে লিখেন, "কুরআন সুন্নাহ তথা অন্যান্য শর'ঈ দলীল মতে ঈদে মীলাদুন্নবীর আয়োজন অনুষ্ঠান ভিত্তিহীন, বরং বিদ'আত। এতে ইহুদী, খৃষ্টানদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এসব অনুষ্ঠানে মুসলমানদের যোগদান করা নাজায়িয। কেননা, এর দ্বারা বিদ'আতের সম্প্রসারণ ও এর প্রতি উৎসাহ যোগানো হয়।" (মাজমুউল ফাতওয়াঃ-৪/২৮০)

ইমাম ইবনুল হাজ্ব মালেকী রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৩৬ হি.) মাদখাল নামক গ্রন্থে লিখেছেন "লোকেরা যে সমস্ত বিদ'আত কাজকে ইবাদত মনে করে এবং এতে ইসলামের শান শওকত প্রকাশ হয় বলে ধারণা করে, তন্মধ্যে রয়েছে মীলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান। রবীউল আউয়াল মাসে বিশেষ করে এ আয়োজন করা হয়, বস্তুত এসব আয়োজন অনুষ্ঠান অনেক বিদ'আত ও হারাম কাজ সম্বলিত হয়"। (মাদখালঃ-১/৯৮৫ আল মিনহাজুল ওয়াজিহঃ-২৫২)

সুতরাং, প্রচলিত ঈদে মিলাদুন্নবী সম্পূর্ণ বিদআত। তবে, যারা একে বৈধ মনে করেন, তারা নিম্নোক্ত আয়াতটির মাধ্যমে দলীল দেওয়ার চেষ্টা করেন।

قُلۡ بِفَضۡلِ اللّٰہِ وَبِرَحۡمَتِہٖ فَبِذٰلِکَ فَلۡیَفۡرَحُوۡا

❝ বলো, এটা (কুরআন) আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার দয়ায় এসেছে। সুতরাং, এতে তারা আনন্দিত হোক। ❞ (সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮)

এটি দেখিয়ে অনেকে বলেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ যেহেতু আমাদের প্রতি আল্লাহর এক রহমত, তাই আমাদের উচিত তার আগমনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা। এটা এই আয়াতের সঠিক ব্যাখা নয়, কারণ এই আয়াতটি দ্বারা কুরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

আর যদি ধরেও নিই যে, এই আয়াতটি থেকে রাসুল ﷺ এর আগমনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে, তাতেও ঈদে মিলাদুন্নবী বৈধতা পায়না। কেননা, রাসুল ﷺ এর আগমনের কারণে কিভাবে আনন্দ প্রকাশ করতে হয়, সেই পদ্ধতি স্বয়ং রাসুল ﷺ শিখিয়ে গিয়েছেন। এর জন্য নিজে থেকে কোনো দিনকে ঈদ বানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ কে সোমবারের দিন রোজা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, "এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং এই দিনেই আমাকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছিলো অথবা, এই দিনে আমার উপর (কুরআন) নাযিল করা হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১১৬২)

কাজেই, আমরা যারা আশেকে রাসুল হতে চাই, প্রিয়নবী ﷺ এর আগমনের জন্য আনন্দ প্রকাশ করতে চাই, তারা বছরের প্রত্যেক সোমবারে এই সুন্নত রোজাটি রাখব এবং রাসুল ﷺ এর প্রতি মহব্বত প্রকাশ করব। এর জন্য, খ্রিস্টান সংস্কৃতির আশ্রয় নিয়ে কোনো বিদআতি কাজ করা থেকে বিরত থাকব।

জ. শবে মেরাজ

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মেরাজের ঘটনাটি একটি মহাসত্য। তিনি এইদিন উর্ধজগতে ভ্রমণ করেছিলেন। এটি বিশ্বাস করা আমাদের ইমানের অংশ। তবে, এই মেরাজ ২৭শে রজবে হয়েছিলো নাকি অন্যকোনো দিন, এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতপার্থক্য আছে।

তবে, প্রতিবছর ২৭শে রজবকে কেন্দ্র করে আমাদের সমাজে কিছু বিদআতি কাজ করা হয়। যেমনঃ-
১) প্রতিবছর এটিকে একবার উদযাপন বা স্মরণ করা।
২) এটিকে শবে কদর বা শবে বরাআত এর মতো মহিমান্বিত ও ফযীলতপূর্ণ মনে করা।
৩) এ তারিখে দিনের বেলা রোযা রাখা।
৪) এ রাতে ইবাদত বন্দেগী অন্য রাতের চেয়ে বেশি করা।
৫) এ রাতে বিশেষ নামায আছে মনে করা।
৬) এ রাতে মসজিদে জমায়েত হওয়া।
৭) এ রাত উপলক্ষে মসজিদে ওয়াজ-মাহফিলের আয়োজন করা।
৮) মিষ্টি জিলাপী বিতরণের আয়োজন করা।
৯) ভালো খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি।

উক্ত কাজগুলো কোনোটিই কুরআন-হাদিস বা সাহাবীদের আমল থেকে প্রমাণিত না। এমনিকি রাসুল ﷺ এর মেরাজ ঠিক কোন বছরের কোন মাসের কত তারিখে হয়েছিলো, এটাও কেউ নিশ্চিতভাবে জানেনা।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “মেরাজ কোন মাসে, কোন দশকে ও কত তারিখে হয়েছে — এ বিষয়ে কোন প্রমাণিত দলীল নেই। এ সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা রয়েছে, তা বিচ্ছিন্ন ও মতভেদপূর্ণ, এতে নিশ্চিত হওয়ার মত কিছু নেই।” (যাদুল মা'আদ, ১/৫৮)

এরপরেও যদি মেনে নেয়া হয় যে, ২৭ই রজব বা অন্য কোন সুনির্দিষ্ট তারিখে মেরাজ সংঘটিত হয়েছে। তখনও উক্ত তারিখ উদযাপন বা বিশেষ গুরুত্ব প্রদান কিংবা কোন আমল করার দলীল-প্রমাণ নেই। কেননা সাহাবা-তাবেঈন থেকে মেরাজ উপলক্ষে কোনো কিছু পালন বা আমল করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। এতে করণীয় কিছু থাকলে অবশ্যই তাঁরা করতেন। আমাদের দেশে ২৭শে রজব বা শবে মেরাজের নানা ফজিলত বর্ণনা করা হয়। তবে, এগুলোর সবই জাল/বানোয়াট, যার উপর আমল করা জায়েজ নয়।

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ লিখেন, “রজব মাসের সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখে রোযার ফযীলত সম্বলিত বিশুদ্ধ কোন হাদীস রাসূল ও সাহাবা থেকে বর্ণিত হয় নি।” (লাতায়িফুল মাআরিফ পৃঃ ২২৮)

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “রজব মাসের ফযীলত ও রোযা অথবা এ মাসের সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখে রোযা কিংবা বিশেষ কোনো রাত্রি উদযাপন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন হাদীস বর্ণিত হয় নি।” (তাবয়ীনুল আজব বিমা ওরাদা ফী ফাযলি রজব, পৃঃ ১১)

এজন্য, এই দিনটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা বা এদিনে কোনো বিশেষ আমল আছে এমন মনে করা বিদআত। কেউ যদি এদিনে রোজা রাখে তাহলে তা অন্য কোনো সাধারণ দিনে রোজার রাখার

মতই গণ্য হবে এবং এই রাতে যদি কেউ নামাজ পড়ে তাহলে তা অন্য কোনো সাধারণ রাতে নামাজ পড়ার মতই গণ্য হবে। মূলত, শরিয়তের দৃষ্টিতে ২৭শে রজব তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো দিন নয়।

শায়খ আবু উমামা ইবনে নাক্কাশ রাহিমাহুল্লাহ (মৃ. ৭৬৩ হি.) বলেন, "শবে মেরাজের আমল উত্তম হওয়া সম্পর্কে কোন সহীহ বা দুর্বল হাদীসও বর্ণিত হয়নি। এ কারণেই রাসূল সাহাবায়ে কেরামকে উক্ত রাত নির্ধারিত করে দেননি এবং কোন সাহাবীও তা নির্দিষ্ট করেন নি। এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে বিশুদ্ধ সূত্রে কিছুই বর্ণিত হয় নি এবং কেয়ামত পর্যন্তও হবে না। আর যে এ সম্পর্কে কিছু বলেছে, সে নিজ থেকেই বলেছে, যা তার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। এ কারণেই এত মতভেদ হয়েছে, যার কোন সুরাহা নেই। অতঃপর বলেন, শবে মেরাজে যদি উম্মতের জন্য সমান্যও করণীয় থাকত, অবশ্যই রাসূল তা সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন।" (আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ, কাসতাল্লানী, ৩/১৪)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "মেরাজ মনে করে কোন রাত নির্ধারণ করে ইবাদত বা অন্য কিছু করা মুসলমানদের জন্য জায়েয নেই।" (যাদুল মা'আদ, ১/৫৮)

ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী (মৃ. ৭৫৬ হি.) বলেন, "২৭ শে রজব মেরাজ উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা বিদআত।" (আস-সায়ফুল মাসলুল, পৃঃ ৪৯২)

অতএব, ২৭শে মেরাজকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিন মনে করা ও এদিনের আমলকে অন্যদিনের তুলনায় অধিক ফজিলতপূর্ণ মনে করা বিদআত। তবে, কেউ চাইলে আর দশটা দিনের মত মনে করে এদিনটিতে সাধারণভাবে ইবাদত করতে পারে। তবে, বিশেষ কোনো ফজিলতের আশা রাখা যাবেনা, যে ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে কিছু বর্ণিত হয়নি।

ঝ. চল্লিশা ও কুলখানি

গ্রামেগঞ্জে কোনো মানুষ মারা গেলে তিনদিন পর কুলখানি ও ৪০দিন পর চল্লিশা হিসেবে পাড়ার মানুষজনকে খাওয়ানো হয়। এটি দ্বারা মৃতের কল্যাণ আশা করা হয় এবং এটাকে, একটি প্রয়োজনীয় ইসলামী কাজ মনে করা হয়। অথচ, কুরআন-হাদিসে এমন কোনো দিক-নির্দেশনা আসেনি।

বরং, এমন রীতিনীতি হিন্দুদের সংস্কৃতি থেকে এসেছে। হিন্দুরা এভাবে তাদের কেউ মারা গেলে নির্দিষ্ট কয়েকদিন পর পর মানুষকে খাইয়ে থাকে, যাকে তারা শ্রাদ্ধ বলে থাকে। সেখান থেকেই, উপমহাদেশের সাধারণ মুসলিমদের মাঝে কুলখানি ও চল্লিশা নামক অনুষ্ঠান দুটি প্রবেশ করেছে। অতএব, এগুলো ইসলামে বিদআত। ইসলামে তো উলটো কোনো মুসলিম মারা গেলে, মৃত ব্যক্তির শোকাহত পরিবারকে খাওয়াতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

একবার রাসুল ﷺ এর কাছে খবর আসে, 'জাফর' নামক এক সাহাবি ইন্তেকাল করেছেন। তখন রাসুল ﷺ বলেন, "তোমরা জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করো। কারণ তাদের নিকট এমন এক খবর এসেছে যা তাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে।" (সুনানু তিরমজি, হাদিস নং ৯৯৮)

এটাই ইসলামের সৌন্দর্য! যেখানে, হিন্দু সংস্কৃতি শোকাহত পরিবারকে বলছে এলাকাবাসীকে খাওয়াতে। সেখানে, ইসলাম এলাকাবাসীকে বলছে শোকাহত পরিবারকে খাওয়াতে। অথচ, শয়তান মানুষকে দিয়ে এত সুন্দর সুন্নতকে রেখে বিদআতকেই গ্রহণ করাচ্ছে। শোকাহত পরিবার গরিব হলে এই প্রচলিত বিদআতের কারণে তারা চাপের মুখে পড়ছে।

তার উপর, চল্লিশা ও কুলখানিতে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে খাওয়ানো হয়। সাহাবিরা এমন জিনিসকে অপছন্দ করতেন। জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ আলবাজালী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, "আমরা (সাহাবাগণ) দাফনের পর মৃতকে কেন্দ্র করে সমবেত হওয়া ও খাবারের আয়োজনকে নিয়াহা (তথা শরিয়তনিষিদ্ধ) মনে করতাম।" (সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৬১২)

এজন্য ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "মৃত্যু উপলক্ষে ভোজ অনুষ্ঠান বিদ'আত। তা আয়োজন করা যেমন মাকরূহ, তেমনি এর দাওয়াত গ্রহণ করাও মাকরূহ।" (ইবনু তাইমিয়্যাহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া, খ. ৮, পৃ. ৩২৬)

তবে, মৃত ব্যক্তির কাছে সওয়াব পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো ভালো কাজ করা ইসলামে নাজায়েজ নয়। চাইলে, এই উদ্দেশ্যে মৃতের পরিবাররা গরিব-দুঃখীদের খাওয়াতে পারে, কারণ এটা একটা মহৎ কাজ। তবে, সাধারণত চল্লিশা ও কুলখানিতে ধনী ও নেতাবর্গদেরকে প্রাধান্য দিয়ে খাওয়ানো হয়। এটা ঈসালে সওয়াবের নীতি পরিপন্থী। ঈসালে সওয়াব তথা মৃতের কাছে সওয়াব পৌঁছানোর জন্য খাওয়াতে চাইলে যারা অভাবগ্রস্ত তাদের খাওয়ানো উচিত।

আর এক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট দিন নেই। মৃতের পরিবার যেদিন খুশি সেদিন খাওয়াতে পারে। ৩ দিন, ৫ দিন, ৭ দিন বা ৪০ দিন পরে খাওয়াতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। তাদের যখন সুবিধা হয়, তখন খাওয়াবে। আর ঈসালে সওয়াব যে শুধু খাওয়ানোর মাধ্যমে হয় তা নয়। চাইলে দান-সাদাকার মাধ্যমেও মৃতের কল্যাণের জন্য ঈসালে সওয়াব করা যেতে পারে।

ঞ. একটি উপদেশ

রোমকদের সাথে আমীরে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু একবার সাময়িক সন্ধিচুক্তির স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু, তিনি পরিকল্পনা করলেন যে সন্ধির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া মাত্রই রোমক সীমান্তে আক্রমণ করবেন। অতর্কিত আক্রমণের ফলে অপ্রস্তুত রোমক বাহিনী খুব সহজেই পরাস্ত হয়ে যাবে। ফলে, মুসলিমদের রক্তক্ষয় কম হবে এবং বিপুল এলাকা দখলে চলে আসবে। এজন্য, মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু সন্ধি শেষ হওয়ার আগে থেকেই সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করতে লাগলেন যাতে, সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই হামলা করতে পারেন।

সন্ধির মেয়াদ শেষ হলো। মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু সৈন্যদের নিয়ে আক্রমণ করলেন। সবকিছু তার পরিকল্পনা অনুযায়ী হলো। রোমক বাহিনী পিছু হটতে শুরু করল। অল্প সময়ের মাঝেই রোমকদের বিরাট এলাকা মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু দখল করে ফেললেন।

চূড়ান্ত বিজয় যখন সুনিশ্চিত এমন সময় সাহাবি আমির ইবনু আবাসাহ রাদিআল্লাহু আনহু এসে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুকে বললেন, "বিশ্বাস রক্ষা করা মুমিনের স্বভাব, ভঙ্গ করা নয়।"

“কী ব্যাপার?”, হয়রান হয়ে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু বললেন। কেননা, তিনি তো সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেই আক্রমণ করেছেন। তাহলে, সমস্যা কোথায়?

আমির ইবনু আবাসাহ রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, “আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, 'দুই পক্ষের সন্ধি হওয়ার পর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে কোনো পক্ষই সন্ধিবিরোধী তৎপরতা চালাতে পারেনা'।”

আমির ইবনু আবাসা রাদিআল্লাহু আনহু বলতে চাচ্ছিলেন যে, মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সৈন্য জড় করেছেন, যা অবৈধ ছিলো।

আল্লহর প্রেরিত পুরুষের এই হাদিস শোনার মাত্রই, আসন্ন বিজয়ের আনন্দে উল্লাসিত আমীরে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু সেনাপতিকে নির্দেশ দিলেন, “যুদ্ধ থামাও, ফিরে চলো।”
এরপর মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহুর নির্দেশে গোটা বিজিত এলাকা শত্রুদের হাতে তুলে দিয়ে মুসলিম সৈনিকেরা ফিরে এলো সীমান্তের অভ্যন্তরে। (সূত্রঃ বাবুল আমান, পৃঃ ৩৪৭)

এটা সত্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার একটি নিদর্শন। একজন মুমিন যখন জানতে পারবে যে, সে যে কাজটি করছে সেটা করতে আল্লাহ ও তার রাসুল ﷺ নিষেধ করেছেন, তখন কাজটি তার যতই প্রিয় হোক না কেন; সে সেটা পরিত্যাগ করবে। মুমিনের স্লোগান সেটাই, যার ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনের বহু জায়গায় বলেছেন,

سَمِعْنَا وَاطَعْنَا

“আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম”।

সুতরাং, কোনো মুসলিমকে যখন কেউ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নিজের ভুল ধরিয়ে দিবে, তখন সে আর দেরি করবেনা। সাথে সাথে, তওবা করে ফেলবে। এটাই সাহাবীদের আদর্শ।

কাজেই, আমার এত দলীল-প্রমাণ বর্ণনার পরে পাঠক যদি বুঝতে পারেন যে, তিনি বিদআতে লিপ্ত আছেন। তাহলে, তার উচিত এইমুহূর্তে তওবা করে ফিরে আসা। আর যদি এগুলো বিদআত ও হারাম হওয়া বা না হওয়া নিয়ে এখনো মনে সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলেও তার উচিত তাকওয়ার খাতিরে এগুলো পরিত্যাগ করা।

কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “হালাল স্পষ্ট আর হারামও স্পষ্ট। আর এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়সমূহ (যেগুলো হারাম বা হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না)। অতএব, তুমি তা পরিত্যাগ করো, যা তোমাকে সন্দেহে নিপতিত করে আর যাতে সন্দেহ নেই, তুমি তা করো।” (সুনানু আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৫৩৯৮)

এখন, অনেকে বলতে পারে যে, “আমি এত হুজুরকে দেখলাম এই কাজগুলো করতে। তারা সবাই কি ভুল করছে?”

জ্বি। যারা কুরআন, সুন্নাহ ও ফাহমুস সালাফের বিরুদ্ধে যায় এমন কাজ করছে, তারা সবাই ভুল করছে। তাদের অনুসরণ করা যাবেনা, সমাজে তাদের যতই মর্যাদা থাকুক না কেন। রাসুল ﷺ নিজেই আমাদেরকে এব্যাপারে সতর্ক করে গিয়েছেন।

রাসুলে করিম ﷺ বলেন, "অচিরেই আমার পরে এমন সব লোক তোমাদের নেতা হবে যারা সুন্নাতকে বিলুপ্ত করবে, বিদআতের অনুসরণ করবে এবং নামায নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে পড়বে।"

কথাটি শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তাদের (যুগ) পাই, তবে কি করবো?"

তিনি বললেন, "হে উম্মু আবদ-এর পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে, তুমি কী করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যচরণ করে, তার আনুগত্য করা যাবে না।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৮৬৫)

অতএব, আমরা সেইসকল আলিমদেরই অনুসরণ করব যারা কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফদের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন এবং বিদআত থেকে বিরত রয়েছেন। আল্লাহ, আমাদেরকে শেষ জামানার ফিতনা থেকে হেফাজত করুক।